Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের গল্পে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাবিনা ইয়াসমিন
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.8
Pages	১৯৯-২১০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুলের গল্পে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

Check for updates

সাবিনা ইয়াসমিন*

'অবস্থা' শব্দের আভিধানিক অর্থ — দশা, হাল, ভাব, গতিক। 'অবস্থান' বলতে বোঝায় — বাস, স্থিতি, বাসস্থান বা location। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত ছোটগল্পসমূহের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে ব্রিটিশ-ভারতের সমাজ-অধিভুক্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভ করা যায়। আঙ্গিকগত সুষমা সব গল্পে রক্ষিত না হলেও চরিত্র নির্মাণদক্ষতা শৈলীর ত্রুটি নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নারী চরিত্রগুলোর জীবনাচরণ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, দুঃখ-দারিদ্র্য, অধিকার-বঞ্চনার মাধ্যমে নারীর প্রতি সমাজের বিচিত্র মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন নারীর জীবনভাবনাকে গল্পভাবনায় রূপান্তর করেছেন নজরুল। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিশ্লেষণ করে সামাজিক স্তরবিন্যাসে তিন শ্রেণির নারীর সন্ধান পাওয়া যায় — উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত। সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে তাঁর গল্পে। এছাড়া অবস্থানগত দিক থেকে গ্রামীণ, নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের নারী চরিত্র নির্বাচন করেছেন তিনি। ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি আফ্রিকা-ইউরোপ পর্যন্ত তাঁর চেতনার বিস্তার। 'নজরুলের কৈশোর কেটেছে রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে, যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে সিন্ধু প্রদেশে করাচির সেনানিবাসে আর যৌবন কলকাতা নগরীতে।' (রফিকুল, ২০১২ : ৮১৪)। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র ভৌগোলিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তাঁর শিল্পিমানস। ভারতীয় উপমহাদেশের অভ্যন্তরে অথবা ভারতবর্ষের ভূগোলের বাইরে নির্মিত নজরুলের নারী চরিত্রগুলোকে মূল প্রবণতা অনুসারে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে :

১। সনাতন/ প্রথাগত নারী (Traditional)
২। প্রথামুক্ত নারী (Non-traditional)। (শাহনাজ, ১৯৯৭ : ২৬)

সনাতন বা প্রথাগত নারী চরিত্র, যারা প্রচলিত আচার-সংস্কারে আস্থাশীল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — বেগম, পরী, শহীদা, মোতি, চানভানু, নূরজাহান। গল্পের কাহিনিবিস্তারে এসব চরিত্র পতিব্রতা, একনিষ্ঠ প্রেমিকা অথবা সমাজ কর্তৃক চাপানো অভিমত অনুযায়ী জীবনাচরণে অভ্যস্ত। এ ধরনের অভ্যস্ততার বাইরে যেসব নারী নজরুলের গল্পে উপস্থিত তারা সামাজিক বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতির অভ্যন্তরে তাদের জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় অথবা সহজাত প্রবণতার বশীভূত হয়ে চরিত্রগুলো দুর্বিনীত রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিন্দি, গুল, হেনা — এসব নারী জীবনভাবনায় এবং কর্মকাণ্ডে নজরুলের গল্পে ব্যতিক্রমী ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রথাবদ্ধ এবং প্রথামুক্ত নারীর বাইরে আর এক শ্রেণির নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা সামাজিকভাবে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

নিগৃহীত এবং কলুষিত জীবনে নির্বাসিত। সামাজিক স্তরবিন্যাসে তাদের কোনো শ্রেণিভুক্ত করা হয়নি, তারা অধঃপতিত। নজরুল এই পতিত নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান এবং তাদের স্বাভাবিক জীবন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। 'মেহের-নেগার' গল্পের গুলশন্ এই শ্রেণিভুক্ত।

নজরুল তাঁর গল্পে প্রথাবদ্ধ যেসব নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, সেই প্রথানুগত্য তাদের জীবন-সংকট নিরসনে ফলপ্রসূ হয়নি। বরং প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে তাদের সুশৃঙ্খল সাজানো জীবন। প্রথাগত ধারণায় 'আদর্শ নারীর প্রধান গুণ হচ্ছে — ধৈর্য্য, ক্ষমা, সতীত্ব, পাতিব্রাত্য ও পতিভক্তি।' (শাহনাজ, ১৯৯৭ : ২৬)। উল্লেখিত চারিত্রিক গুণাবলির প্রত্যেকটি বিদ্যমান বেগম চরিত্রে। 'স্বামীহারা' গল্পে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বেগম জীবননির্বাহ করলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আভিজাত্যের সংস্কারে অন্ধ সমাজের রোষানলে পতিত হয় সে। মুসলমান সমাজের অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত আশরাফ, আতরাফ এবং আরজল নামক শ্রেণিকরণের বৈষম্যে আক্রান্ত বেগম। স্বামী ও শাশুড়ির মৃত্যুর পর তাকে জোরপূর্বক গৃহ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। জীবিতাবস্থায় তাঁর আশ্রয় হয়েছে গোরস্থান। 'বন-জঙ্গল' সদৃশ সমাজ এবং 'জন্তু' সমতুল্য মানুষের সংস্পর্শবিহীন গোরস্থানের নিভৃত, নির্বাসিত জীবনকেই শ্রেয় মনে হয়েছে তার কাছে : 'যেখানে শুধু এই রকম অবমাননা, সেখান থেকে সরে এসে এই মরার দেশে থাকাই ভালো।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৭১৬)।

বেগমের 'জোবেহ্ করা জানোয়ারের মত' যন্ত্রণাকাতর জীবনের প্রত্যক্ষ দায় নজরুল সমাজের কাঁধেই প্রত্যর্পণ করেছেন। তবে তিনি যে সবসময় সমাজকে নারীর প্রতিপক্ষ বিবেচনায় সচেষ্ট ছিলেন তা নয়। 'স্বামীহারা' গল্পে বেগমের শাশুড়ি এবং তার স্বামী এই পরিচিত সমাজের মানুষ হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। মূলত বেগমের শাশুড়ি এই গল্পে নজরুলের মানস-প্রতিনিধি। বৈষম্যহীন, শ্রেণিভেদমুক্ত, উদার সমাজব্যবস্থার যে আদর্শ তাঁর মজ্জাগত, সেই অভিন্ন সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে বেগমের শাশুড়ির সুদৃঢ় উচ্চারণে : 'জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিফের মত সেই ত আশরাফ।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৭১৩)। বাঙালি সমাজের অভ্যন্তরলোকে প্রবহমান এসব সংস্কার বিষয়ে নজরুল প্রত্যভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে গ্রামীণ সমাজের একজন সাধারণ গৃহী নারীর সাজানো জীবনের পতন এবং করুণ হৃদয়ের আর্তি তাঁর গল্পে অসামান্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'স্বামীহারা' গল্পের কাহিনি এবং বেগম চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকগণ নানা মত উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত কয়েকটি মন্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. স্বামীহারা গল্পে এক হতভাগ্য বিধবার জবানীতে বাংলার শত-সহস্র বিধবার ট্র্যাজেডি রূপায়িত।

খ. হৃদয়জাত সত্যের প্রতি একান্ত অনুগত থেকে বেগম শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। তার করুণ পরিণতি পাঠক চিত্তে যেমন সমবেদনা ও সহানুভূতি সঞ্চার করে, তেমনি আবার তার হৃদয়ের গভীরতম প্রেমবোধ ও প্রেমোপলব্ধি পাঠককে আলোড়িত করে। (শাহনাজ, ১৯৯৭ : ৬৩)।

নজরুলের এক একটি গল্পে এক একজন স্বতন্ত্র নারী চরিত্র নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পের দুটি ব্যতিক্রমী এবং সাহসী চরিত্র হেনা ও গুল্। একদিকে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, প্রেম ও দ্রোহের নির্ভীক প্রকাশ; অপরদিকে স্বদেশ-সমকালের দাবি আদায়ের প্রয়োজনে চরিত্র দুটি সৃষ্ট। মানসিক শক্তিতে সুদৃঢ়, স্বাধীন মত প্রকাশে সক্ষম এরকম নারীর সংখ্যা তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজে ছিল নগণ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে নজরুল যখন বাংলা গল্পের অঙ্গনে প্রবেশ করেন সেসময় বাঙালি নারী বিশেষ করে মুসলিম নারীরা ছিল পশ্চাদপদ। তখনও তাদের অর্গলমুক্তি পরিপূর্ণভাবে ঘটেনি। পরাধীন ভারতের জন্য স্বাধিকার আন্দোলনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল না। একারণে নজরুল ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের চরিত্রে প্রতিস্থাপন করেছেন তাঁর স্বাধীন, স্বনির্ভর ও সচেতন নারীর স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা। নারীকে মত প্রকাশের যে-স্পর্ধা তিনি দান করতে আগ্রহী তাকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল গুল্-এর মতো তেজোদ্দীপ্ত নারী।

'রিক্তের বেদন' গল্পে সৈনিক নায়ক তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছে প্রিয় নারী শহিদার স্মৃতি। বাঙালি নারী শহিদার অপসৃয়মাণ স্মৃতির পাশে সদর্পে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে বেদুঈন নারী গুল্। শহিদা ও গুল্-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীত। নজরুলের বর্ণনায় এই দুজন নারীর বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে অন্দরবাসিনী শহিদা অবরুদ্ধ, মত প্রকাশের অক্ষমতায়, ভীরুতায়, লজ্জায় বিপর্যস্ত : 'সেও কিছু বলেনি, যতদিন বাড়িতে ছিলুম, ততদিন শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। তারপর বিদায়ের ক্ষণে তাদের ভাঙা দেয়ালটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় তাকিয়ে ছিল।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬৬৭)। ভাঙা দেয়ালটা এখানে প্রতীকী অর্থে শহিদার জীবন, তার বিচরণক্ষেত্র এবং আত্মপ্রকাশক্ষমতার পরিসীমা নির্দেশ করেছে। অন্যদিকে গুল্ স্বাধীনচেতা, নিজের অভিমত সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনে শুধু দক্ষই নয় বরং তার সিদ্ধান্তে অনড় : 'ডালিম ফুলের মতই রাঙা টুকটুকে একটি বেদুঈন যুবতী পাকড়ে বসেছে যে, তাকে বিয়ে করতেই হবে। সে কি ভয়ানক জোর-জবরদস্তি।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬৬৯)। 'জোর-জবরদস্তির' এই দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশের অপারগতায় 'কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে পড়া' বাঙালি নারী শহিদার কোনো সংস্পর্শ নেই। এই 'জোর-জবরদস্তির' দৃষ্টান্তের উপস্থাপন-প্রয়াস মূলত বাঙালি নারীর বন্দীজীবনের মুক্তিকামনার্থে।

নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পের পটভূমি বেলুচিস্তান। গল্পটির পর্ব-বিভাজনে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাসে। তিনি সন্দীপ, নিখিলেশ ও বিমলার আত্মকথন দিয়ে সাজিয়েছিলেন 'ঘরে-বাইরে'র কাহিনি। নজরুল সেই রীতিটি প্রয়োগ করেছেন গল্পে। 'ব্যথার দান' গল্পটির কাহিনি দারা, বেদৌরা ও সয়ফুল্-মুল্ক-এর আত্মবয়ানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে । বেদৌরা বাংলার বাইরের নারী। তার চরিত্রটি বাঙালি নারীরই প্রতিরূপ। বেদৌরা এবং দারার প্রেম পরিণতি লাভে ব্যর্থ হয় 'মামা' নামক তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপে, যার পেশিশক্তির প্রয়োগ তাদের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ :

> এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর ক'রে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আমার একটা কথাও বিশ্বাস ক'রলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মত একটা ঘর-বাড়ি-ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হ'তেই পারে না।... (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬০৫)।

অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয় এমন প্রেমিকের হাত থেকে বেদৌরাকে উদ্ধারের মাধ্যমে মামা চরিত্রের আপাত মঙ্গলকামিতার প্রকাশ ঘটেছে। গল্পে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত মামার জবরদস্তির অন্তরালে চাপা পড়েছে নারীর স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা। ফলে বেদৌরা চরিত্রটি হয়ে উঠেছে অধিকারবঞ্চিত, অসহায় বাঙালি নারীর প্রতিচিত্র। মামা কর্তৃক জোরপূর্বক এই বিচ্ছেদ এবং দারার ব্যর্থ অন্বেষণ শেষে ক্ষত-বিক্ষত বেদৌরার অন্ধ প্রবৃত্তির হাতে নিজেকে সমর্পণের ঘটনা ঘটে। এ গল্পে পবিত্র প্রেম ও পঙ্কিল কামনার সরল পার্থক্য দেখানো নজরুলের একমাত্র অভিপ্রায় নয়। 'ব্যথার দান' গল্পের কার্যকারণসূত্র বিশ্লেষণ করলে বেদৌরার প্রেম, বিচ্ছেদ ও স্খলনের নেপথ্যে আমরা দেখতে পাই মামা নামক তৃতীয় শক্তির ভূমিকা। গল্পের পরিসরে তার উপস্থিতি স্বল্প সময়ের হলেও বেদৌরার জীবনে ব্যথার দান মূলত মামারই কীর্তি।

'নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে' (শৈলজানন্দ, ১৯৬০ : ১২৫) — ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দেবার পেছনে এটি ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন হৃদয়াভিলাষ। সৈনিক জীবন-পরিধিতে নজরুলের গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং সেই সূত্রেই বাংলার বাইরের জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তি। গল্পের প্লট ও চরিত্র নির্মাণে তিনি ভারতবর্ষের বাইরের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করলেও স্বদেশের আবহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। একারণে অনেক সময় বিদেশের প্রকৃতির সঙ্গে স্বদেশের প্রকৃতিকে যেমন একাকার করে চিত্রায়িত করেছেন নজরুল, তেমনি বাইরের নারীর অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাঙালি নারীর চিরন্তন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং সমস্যা-সংকট। তাছাড়া নজরুল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে দেশ-কাল-ভূগোলের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন চেতনা-বিস্তারে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশ-কাল নির্বিশেষে মানুষের ভেতরের রূপটিকে বাইরের আলোয় উন্মোচিত করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর অভিমত : 'সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ২১)। 'হেনা', 'রিক্তের বেদন', 'মেহের-নেগার' এবং 'বাদল-বরিষণে' গল্প-চতুষ্টয়ে আন্তর্জাতিক পটকে স্পর্শ করে নারীর সর্বজনীন অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন নজরুল। গল্পগুলোতে নারীর ভূমিকা প্রতিনিধিত্বশীল । কাহিনি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গভীর প্রণয়কে দুঃসাহসী চারিত্র্য এনে দিতে নজরুল হেনা ও গুলের মত নায়িকা নির্মাণ করেছেন। 'হেনা' গল্পের হেনা কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে তার ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালনের সূত্রে। স্বদেশের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ, স্বদেশের প্রতি প্রবল দায়িত্ববোধ, গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং প্রেমের প্রগাঢ়তায় হেনা মহিমান্বিত। সোহরাবের মতো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়েও সে বীরাঙ্গনা। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্তি ছিল খুব সীমিত এবং অপ্রত্যক্ষ। সেই

দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল স্বদেশের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগকারী হেনাকে উপস্থাপন করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার প্রেরণা তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছেন। তাছাড়া 'হেনা' গল্পে তিনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে সমকালীন বাঙালি মানসিকতার সংকীর্ণতাকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেছেন। ফ্রান্সে যুদ্ধরত সোহরাবের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন সেদেশের নারীর স্বাধীন রূপ। তেরো-চৌদ্দো বছরের এক কিশোরীকে দেখে তার আক্ষেপ : 'আমাদের দেশে ওরকম মেয়ে নিশ্চয়ই সন্তানের জননী নতুবা যুবতী গিন্নী।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬১৬)। তাঁর সমসাময়িককালে ভারতবর্ষে নারীর শিক্ষা, কর্মজীবন যাপন অথবা বাইরের পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে বিচরণের সুযোগ ছিল না। সেই জীবনের সীমাবদ্ধতা নজরুল জানতেন। এজন্য তিনি বলেছেন :

> আজ সেই বিদেশিনী কিশোরী আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কি পরিষ্কার সুন্দর ফিট্‌ফাট্ বাড়িগুলো এদের। মেয়েটা আমাকে খুব ভালবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমাদের দেশে হ'লে ব'লত মেয়েটা খারাব হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি-একুশ বছরের একজন যুবকের সঙ্গে একটা কুমারী কিশোরীর মেলা-মেশা আদৌ পছন্দ করত না। (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬১৭)।

গল্পে ফ্রান্সের যে জীবনছবি নজরুল এঁকেছেন তা কতখানি বাস্তবনিষ্ঠ সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে তিনি যে এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে বাঙালি নারীর যথার্থ মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পেও তিনি দেখিয়েছেন কত অল্প বয়সে ভারতীয় নারী অন্দরমহলের বন্দীজীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। কিশোরী নয়, একেবারে বালিকা বয়সে মোতি বাইরের মুক্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। নায়কের আত্মকথনে তার বাঞ্ছিতা মোতি প্রসঙ্গে জানা যায় : 'সে যখন এগারোর কাছাকাছি, তখন তাকে জোর করে অন্দর-মহলের আঁধার কোণে ঠেসে দেওয়া হলো।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬৪৬)। নির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ করে ভারতীয় নারীরা কোন বয়সে গৃহবন্দী হয় তার একটা পরিসংখ্যান নজরুল দিয়েছেন। 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পে আরও জানা যায়, মাত্র পনেরো বছর বয়সে মোতির বিয়ে হয় 'মস্ত বড় জমিদার'-এর ছেলের সঙ্গে। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে জমিদাররা ছিল একটি বিশেষ শ্রেণি। মোতির কাঙ্ক্ষিত নায়কের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য শনাক্ত করতে নজরুল এই শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, নারীর মানসিক সুখ বা পরিতৃপ্তির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্তরালে। এরকম সমাজব্যবস্থায় নারীর পছন্দ-অপছন্দের মূল্যায়ন প্রত্যাশা করা অর্থহীন। একারণে পরাক্রমশালী সমাজকে কটাক্ষ করে নারীর প্রতি তাঁর বক্তব্য : 'তোমাদের কোন ব্যক্তিত্বকে ভালোবাস্‌বার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালোবাস্‌তে হবেই। ...' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬০৫)

'ব্যথার দান', 'হেনা', 'রিক্তের বেদন' এবং 'অতৃপ্ত কামনা' গল্পের কাহিনি ও নারী চরিত্র নির্মাণ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁদের এ সম্পর্কিত অভিমত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. 'ব্যথার দান'-এ কোথাও বেদৌরার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়নি। বরং পদস্খলনের পরও বেদৌরাকে মর্যাদাময়ী করে রাখার প্রয়াস ছিল তৎকালীন সময়ের বিবেচনায় নতুন, উদার ও সংস্কারমুক্ত শিল্পচেতনার নিদর্শন, নারী সম্পর্কে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। (শাহনাজ, ১৯৯৭ : ৫৮)।

খ. হেনা তার প্রেমিক সোহরাবকে প্রেরণাদীপ্তই করেনি নিজেও যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশের প্রেমে উদ্বেলিত হয়েছে। (মাসুমা, ২০০১ : ১১৮)

গ. মোতির চারপাশের এই দেয়াল, এই অন্তঃপুরের অবরোধ সমকালীন নারী সমাজের অসহনীয় অবস্থার এক বাস্তব চিত্ররূপ। (শাহনাজ, ১৯৯৭ : ৫৯)।

বাংলা সাহিত্যে গল্পকার নজরুলের আত্মপ্রকাশ ১৯১৯ সালে 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'র মাধ্যমে। এসময় সৈনিক জীবনের পরিবৃত্তে লেখা 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার' — গল্পগুলো তাঁকে সম্ভাবনাময় গল্পকার হিসেবে সমকালে পরিচিতি এনে দেয়। সৈনিক জীবন সমাপ্ত করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর গল্পকার পরিচিতি অক্ষুণ্ন ছিল। 'সেই প্রথম বয়সে নজরুল গল্পলেখক হিসাবেই পাঠকদের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করেছিলেন।' (কাদির, ১৯৮৯ : ২০০)। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের পূর্বে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে চুরুলিয়া, দরিরামপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের আবহে। দুঃখ-দারিদ্র্যে লালিত নজরুলের পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। একারণে সমকালীন সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলো তাঁর শিল্পিমানসে ধরা পড়েছে। তাঁর জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির নেপথ্যে ছিল বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ। সেই প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে তিনি নারীকে সংস্কারের বাহুল্য থেকে অবমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ গল্পেই নজরুল নারীকে স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা দানের প্রয়াসী। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পেও নারীর সামাজিক বঞ্চনার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার সমালোচনা উঠে এসেছে এখানে। বিয়ের সময় বর পছন্দের ক্ষেত্রে নারীর মত প্রকাশের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। অন্দরমুখী, গৃহী জীবনে প্রবেশের প্রারম্ভেই এই প্রবঞ্চনা এবং মত প্রকাশের অনবকাশের কথা তিনি গল্পে উল্লেখ করেছেন :

> মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারা জাত হলেও তাদেরও একটা পসন্দ আছে। তারাও ভালো বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষ মানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে তাদের কোন কষ্ট দেখেও দেখিনে। (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬৮০)

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন :

> আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মত নিজের বৌ পছন্দ করে আনে। নিজের শরীর যে আবলুশ কাঠের চেয়েও কালো বা কেঁদ কাঠের চেয়েও এব্ড়োথেব্ড়ো সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুরমত দুধে-আলতার রং, হরিণের মত নয়ন, অন্তত পটলচেরা ত চাই-ই, সিংহের মত কটিদেশ, চাঁদের মত মুখ, কোকিলের মত কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মত গমন; (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬৮০)।

বাঙালি সমাজে নারীর প্রতি স্বার্থপর ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'বাদল-বরিষণে' গল্পের কাজরিয়া চরিত্রে। কৃষ্ণবর্ণের কারণে তাঁর নামকরণ হয়েছে কাজরিয়া।

প্রেমিক পাঠান যুবকের প্রতি তার সাবধানবাণী : 'দেখ বিদেশী পথিক! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজরিয়া বলে উপহাস করে।' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬২৮) উপহাসের সেই নামেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার আত্মপরিচয়, দ্বিতীয় কোনো নামের সন্ধান গল্পে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবর্ণের প্রতি সমাজের এই অবমাননাকর আচরণ কাজরিয়ার ব্যক্তিত্বে প্রবল আঘাত হানে। ফলে আত্মহননের পথ অবলম্বন করে সে। কালোবর্ণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্য করেছেন, 'কৃষ্ণকলি' অভিধা প্রদান করেছেন। আবার নারীর এই কালো বর্ণ নিয়ে শঙ্কা এবং রূপহীন কুশ্রীতার প্রতি সামাজিক উপেক্ষা, অবহেলা, অবজ্ঞা ও নির্দয়তার ভয়াবহ রূপটি উঠে এসেছে 'স্ত্রীর পত্রে'। কালো মেয়ে বিন্দু প্রসঙ্গে মৃণালের মূল্যায়ন : 'একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে — কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৩৩৪)। সেই কালো মেয়ে বিন্দুর পরিণতি কাজরিয়ার চেয়ে ভালো কিছু হয়নি। বাঙালি সমাজব্যবস্থায় এই রূঢ় মনোভাব, অমানবিক রীতি প্রচলিত ছিল বলেই নজরুল বিষয়টিকে গল্পের কেন্দ্রে বিন্যস্ত করেছেন।

নজরুল রচিত 'মেহের-নেগার' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুলশন্। তার স্খলিত জীবনের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল সমাজ। আবার সেই সমাজের স্বাভাবিক জীবনপ্রক্রিয়া থেকে এই শ্রেণির নারীদের অবস্থান সুদূর এবং সংগোপন। সভ্য সমাজের 'বাবু'দের কৌশলে সৃষ্ট এই নারীরা স্বাভাবিক নারীদের মতো বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত। একারণে গুলশনের জীবন মাতৃপেশা ও পরিচয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। সে নায়ক ইউসুফের স্বপ্নসারথি হলেও তার বাস্তব পরিচয় সে নিজেই ব্যক্ত করেছে : '...আমাকে চেন না? এই শহরে যে খুরশেদজান বাইজীর নাম শুন, আমি তারই মেয়ে।...রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র!' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৬৮৮)। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবাস্তবতায় বাইজি একটি বিশেষ পেশাজীবী শ্রেণি। সমাজের উঁচু স্তরের অভিজাতদের বিলাসের প্রয়োজনে তারা সৃষ্ট। বাবুসমাজের কাছে তাদের সমাদর থাকলেও সাধারণের বিচারবোধে তারা ছিল ঘৃণ্য। মানুষের প্রকৃত শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার স্বাভাবিকভাবেই তাদের ছিল না। নায়ক য়ুসোফ গুলশন্‌কে দুর্লভ ভালোবাসার সম্মান প্রদান করেছিল। য়ুসোফের প্রকৃত প্রেম তার বোধের দ্বার খুলে দিয়েছে, সেখানে একই সঙ্গে প্রবেশ করেছে প্রেমের আনন্দ, অ-প্রেমের অনুশোচনা এবং আত্মপরিচয়ের গ্লানি। গুলশনের আত্মোপলব্ধি ও বাস্তববোধ তার মৃত্যুর কারণ। নজরুল দেহের অপবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। 'বারাঙ্গনা' কবিতায় তাঁর যে সুস্পষ্ট অবস্থান, 'মেহের-নেগার' গল্পে নায়কের উদার মানসিকতা তাঁর সেই চেতনাকে আরও পূর্ণতা দিয়েছে। 'বস্তুত গুলশন বা মেহের নেগারের অন্তর্বেদনা, সামাজিক সংস্কারউদ্ভূত জন্ম-যন্ত্রণা, অশুচিতাবোধ ও অন্তর্নিহিত প্রবল প্রেমাকাঙ্ক্ষা ব্যতিক্রমী মহিমায় তার চরিত্রকে মর্মস্পর্শী করে তোলে।' (শাহনাজ, ১৯৯৭ : ৬১)। প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীর করণীয় প্রসঙ্গে নজরুলের কবিতায় রয়েছে দিকনির্দেশনা। নানাবিধ নিগ্রহের শিকার নারীর কানে জাগ্রত হওয়ার মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তিনি :

এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
(নজরুল, ১৯৬৬ : ২৪৩)

নজরুল নারীর রুদ্র শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 'রক্তাম্বরধারিণী মা' ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় দেবীর রুদ্র রূপের বন্দনা করে তিনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। নারীর অসহায় প্রতিমূর্তি পর্যবেক্ষণ করে নজরুল নিজের প্রবল বিদ্রোহী শক্তির মোক্তারনামা সমর্পণ করেছেন তাদের হাতে। তাঁর একটি নারী চরিত্র বিন্দি, যার সমাজপ্রদত্ত নাম 'রাক্ষুসী'। বিন্দি বীরভূম অঞ্চলের বাগদি সমাজভুক্ত । তাঁর পূর্বে সাহিত্যে এই স্তরের মানুষদের প্রসঙ্গ এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে। 'শাস্তি'র চন্দরা এবং 'রাক্ষুসী'র বিন্দি নিম্নবর্গের সমাজবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। 'যে কোন ভুলে মেয়েরাই কাটা পড়েছে' অথবা 'পুরুষের সাত খুন মাফ' — বিন্দির এই আত্মলব্ধ জ্ঞান চন্দরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রাত্য এ দুজন নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রবল। প্রবঞ্চিত চন্দরার বারবার মিথ্যা স্বীকারোক্তি ছিদাম রুইয়ের ওপর কঠিন মানসিক আঘাত। অন্যদিকে বিন্দির আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তির ভেতরে ছিল প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোর সমালোচনা। তবে গল্পের কাহিনিবিস্তারে দুটি নারী চরিত্রের অবস্থানগত সাদৃশ্য থাকলেও অবস্থার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুইয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সংকটের সঙ্গে চন্দরার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্তি ছিল না। জীবনের এক গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, অস্তিত্বের সংকট এবং সম্পর্কের আপেক্ষিকতার কেন্দ্রে প্রতিস্থাপিত চন্দরা। অন্যদিকে বিন্দি নিম্নশ্রেণির মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ে সরাসরি সম্পৃক্ত। তার ভেতরে স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার প্রচেষ্টা ছিল। গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত থাকায় সংসারের সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে তার অবদানও কম ছিল না। শুধু সংসার নির্বাহ নয়, সন্তানের বিয়ের নিমিত্তে তার ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের কথাও জানা যায়। সেই সঞ্চয়ের ওপর পাঁচুর বাপের আক্রমণ এবং লুণ্ঠন বিন্দির অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর একটি বড় চাপ। অন্যদিকে ধর্মীয়ভাবে বিপথগামী, ব্যভিচারী স্বামীর পাপের দায়ভার স্ত্রীর ওপরে চাপানো হয়েছে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় — এই ত্রিবিধ পতনের আশঙ্কায় বিন্দি হয়েছে স্বামী-হন্তারক। প্রাপ্য আইনী সাজা ভোগ করে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করার পর তার ওপর সামাজিক ও মানসিক অত্যাচারের পৌনঃপুনিকতা তার সুস্থ জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। মেয়ের বিয়ে ভেঙে, ছেলেকে এক ঘরে করে, তাকে রাক্ষুসী উপাধি দিয়েও সমাজের মনে হয়েছে তার শাস্তি যথেষ্ট হয়নি। কিন্তু বিন্দির 'ইটারনাল শাস্তি'র ব্যবস্থা নজরুল করেছিলেন। সে বলেছে : 'তা ছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা-সর্বদা কিরকম মোচ্‌ড়ে মোচ্‌ড়ে উঠ্‌ত, তা কে বুঝ্‌ত বল্ দেখি, বুন্?' (নজরুল, ১৯৬৬ : ৭০১)। বিন্দির ভেতরে উত্থিত এই যন্ত্রণাবোধ তাকে নতুন করে মানুষ ভাবার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে। ভারতচন্দ্র (আ. ১৭০৫-১৭৬০) মধ্যযুগের নারীকে 'বিশেষণে সবিশেষ' উচ্চারণের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী' বলে নারীর অধিকারের সীমা আরও প্রসারিত করেছেন। নজরুল সেই নারীকে দিয়েছেন তাঁর বিদ্রোহী শক্তির মোক্তারনামা এবং 'সোজাসুজি সত্যিকার বিচারের অধিকার'। 'মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, তারক গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে নারীর মূল্যায়নের যে প্রাথমিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তার চরম পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তাঁদের পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে। আজকের দিনে

নারীকে মধ্যযুগীয় আলোকে দেখা হয় না, সংস্কারের অভ্রভেদী প্রাসাদকে ভেঙে তার মর্যাদা, তার অধিকার, তার দাবি সমস্তই মেনে নেওয়া হয়েছে। নজরুল সাহিত্যে নারীও এই অধিকারের দাবিতে স্বীকৃত।' (আজহার, ১৯৯৭ : ৩১৯) নজরুল ছিলেন শ্রেণি-সচেতন একজন গল্পকার । এ কারণে সামাজিক স্তরবিন্যাসে 'তলেরও তল' নারীর প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছিল তাঁর সহানুভূতি।

'নজরুল যখন গল্প লিখছেন তখন যুদ্ধ-পরবর্তী সময়। ব্যথার দান, রিক্তের বেদনের অধিকাংশ গল্পে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহ আছে। সমাজ ব্যবস্থার নানা রকম পরিবর্তনও লক্ষণীয়। এ পরিবর্তন-প্রতিবাদ কবিতায় বর্তমান। তেমনি গল্পেও দুর্লক্ষ্য নয়। 'রাক্ষুসী', 'অগ্নিগিরি' প্রতিবাদী গল্প।' (খালেদা, ২০০২ : ২৬) 'অগ্নিগিরি' গল্পের নায়ক গ্রামের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সবুর আখন্দ। নজরুলের গল্পের একমাত্র বিদ্রোহী নায়ক যাকে তিনি জ্বলে ওঠার মন্ত্র দান করেছিলেন। কাপুরুষোচিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসা এবং প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রেরণা হিসেবে নেপথ্যে ছিল একজন নারী। নূরজাহানের কথার আঘাতে জেগে ওঠে সবুরের ব্যক্তিত্ব। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দীক্ষা সে নূরজাহানের কাছ থেকে পেয়েছিল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সবুর খুনের দায়ে সাত বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয়। ফলে সবুর ও নূরজাহানের নির্মল প্রেমসৃষ্টি এবং পরিণতির যে একটা শুভ সম্ভাবনা ছিল সেটি নষ্ট হয়ে গল্প ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। তবে সেই ট্র্যাজেডি যতটা না সবুরের তার চেয়ে অনেক বেশি নূরজাহানের। সবুরের সঙ্গে নূরজাহানের অনুরাগের বিষয়টি যখন আলি নসিব মিঞা জানতে পারলেন ততদিনে সবুর জেলে। পিতা হিসেবে তিনি এই ঘটনার সামাজিক বাস্তবতার ভয়াবহ দিকটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন : 'আলি নসিব মিঞা যেন আজ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। আজ সবুর তার দুঃখ দিয়ে তাঁর সুখের বাকি দিনগুলোকেও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল!' (নজরুল, ১৯৭০ : ৭০১)। ফলে কুৎসার দায় এড়াতে নূরজাহানের পরিবার স্বদেশ ছেড়ে মক্কায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঁচতে গেলে যেসব বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় 'স্বামীহারা' এবং 'রাক্ষুসী' গল্পে নজরুল সে বিষয়গুলো দেখিয়েছেন। সুতরাং নিরাপদে বাঁচার জন্য নূরজাহান-পরিবারের কাছে দেশত্যাগই শ্রেয়তর করে তুলেছেন তিনি।

নারীর বিচিত্র রূপ ধরা পড়েছে নজরুলের গল্পে। মা, বোন, প্রেয়সী বা স্ত্রী হিসেবে নারীরা তাঁর গল্পে নানামুখী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তারা কেউই নির্বোধ অথবা কুটিল নয়। নজরুলের গল্পে স্বনির্ভর, সাহসী, সমকাল ও স্বদেশ-সচেতন অনেক নারীর সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু খল কোনো নারীকে নিয়ে তিনি কাহিনি তৈরি করেননি। নারীর প্রতি অগাধ আস্থা থেকেই সম্ভবত তিনি তাদের নেতিবাচক দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন। 'রাজবন্দীর চিঠি'-তে তিনি নারীর প্রতি বিরূপ হলেও সেগুলো মূলত আবেগীয় অনুযোগের প্রকাশ। নারীকে 'কোমলপ্রাণা' এবং তার বন্ধনকে তিনি 'ফুলের শিকল' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারী সময়ে পরশপাথর হয়ে মানুষকে আমূল বদলাতে পারে। 'জিনের বাদ্‌শা' গল্পে চান ভানুর সংস্পর্শে এসে আল্লা-রাখার মতো বখাটে যুবকেরও ভাবান্তর ঘটে গিয়েছিল :

> যে দিন চান ভানু তাঁর চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেই দিন থেকে তার রক্তের সমস্ত বিষ — সমস্ত দ্বেষ লোভ ক্ষুধা — সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল। তার মনের দুষ্ট শয়তান সেই একদিনের সোনার ছোঁওয়ায় যেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। পরশমণির ছোঁওয়ায় ওর অন্তরলোক সোনার রঙে রেঙে উঠেছিল। (নজরুল, ১৯৭০ : ৭৪৫)।

ইউরোপের নারী আন্দোলনের প্রভাব অথবা নিজস্ব কর্তব্যবোধ যেটাই হোক, নজরুল নারীকে স্বাধীন কর্মপরিবেশ এবং বাঁচার স্পর্ধিত অধিকার দানে প্রয়াসী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে এবং সাহিত্যে তাদের নিয়ে যেভাবে তিনি ভেবেছেন, অনেক দেশবরেণ্য রাজনীতিবিদ বা নেতাও সেভাবে ভাবতে পারেননি। শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর সমকালে একজন জনদরদী নেতা। তাঁর জনতাপ্রীতি কিংবদন্তিতুল্য। তিনি স্বাধীন জনতার কথা ভেবেছেন। নজরুলও জনসাহিত্য নিয়ে যেমন ভেবেছেন তেমনি জনগণকে নিয়েও ভেবেছেন। এই জনতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলার সাধারণ জনতা। জনসাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই।' (নজরুল, ১৯৮৪ : ১১১) জনগণের সঙ্গে যোগের অর্থ নারী এবং পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধে জানা। এই জানা যদি এককেন্দ্রিক হয় তাহলে সাহিত্যে যেমন সফলতা আসে না, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তা একপেশে হয়ে পড়ে। একারণে নজরুল তাঁর 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালী'র 'উদ্দেশ্য' অংশে বলেছেন : 'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।' (নজরুল, ১৯৮৪ : ৭৬) বাঙালি সমাজে এভাবে নারীকে রাজনীতি ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট করে দেখার প্রবণতা ছিল না। নজরুল সূক্ষ্ম মাত্রায়, স্বতন্ত্রভাবে নারীর কায়িক শ্রমের বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠনপ্রণালীর 'কর্মনীতি ও সংকল্প'তে শ্রমিক হিসেবে নারীর প্রাপ্য স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। 'শ্রমিক'-এর দ্বিতীয় কর্মনীতিতে বলা হয়েছে :'প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা; নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ শর্ত নির্ধারিত করা।' (নজরুল, ১৯৮৪ : ৭৬) এছাড়া নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকার 'সন্ধ্যা প্রদীপ' অংশটি নারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের নিঃস্ব জীবনযাপনচিত্র যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন অভিজাত শ্রেণির বিলাসমণ্ডিত জীবন। তাঁর গল্পে একদিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে বাগদি নারী বিন্দি, অন্যদিকে শিক্ষিত সুশীল সমাজের নারী শিউলি। 'শিউলিমালা' গল্পের শিউলি চরিত্রে নজরুল আধুনিক নারীর সব গুণ যুক্ত করেছেন, শুধু বাঞ্ছিতকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেননি।

নজরুলের অস্থির, বোহেমিয়ান জীবনে শৃঙ্খলা না থাকলেও ছিল অবাধ-অগাধ প্রেম। নজরুলের গল্পে যেমন প্রেম রয়েছে তেমনি তাঁর প্রেমেরও অনেক গল্প রয়েছে। বহু নারীর আগমন ঘটেছে তাঁর জীবনে। তবে সবাই যে গৃহের দাবি নিয়ে এসেছে এমন নয়। নারীর প্রতি নজরুলের এবং নজরুলের প্রতি নারীর ভালোবাসার রকম বহুমুখী। তাঁর জীবনে আসা নারীর সুদীর্ঘ তালিকায় রয়েছে মা, বোন, বন্ধু এবং একাধিক প্রেমিকা। তিনি তাদের

স্নেহ-ভালোবাসা-সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ হয়েছেন, আবার কারণে-অকারণে বঞ্চনা ও বিচ্ছেদের আঘাতে আহত হয়েছেন। আনন্দ ও আঘাতকে তিনি শিল্পের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহারা হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। একারণে গান, কবিতা থেকে শুরু করে গ্রন্থ পর্যন্ত তাদের নামে রচিত ও উৎসর্গীকৃত। বিরজাসুন্দরী দেবী, মিসেস এম. রহমান, গিরিবালা দেবী প্রমুখ নারীর অভিভাবকত্ব এবং মাতৃস্নেহ বর্ষিত হয়েছে তাঁর ওপর। নার্গিস ও প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের সুগভীর হার্দ্যিক প্রণয় ছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাঁর নামের সঙ্গে ফজিলতুন্নেছা, রানু সোম, উমা মৈত্রেয়[১], লীলা মজুমদার[২] — এসব নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ফলে নারীর উপস্থিতি এবং উপস্থাপন ছিল তাঁর সাহিত্যের একটি অনিবার্য অংশ। 'নজরুলের জীবনের নানা ঘটনাপরিক্রমায় তাঁকে আমরা বারবার নারীর কাছেই ফিরে আসতে দেখি। নারীই যেন তাঁর চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল।' (আল মাহমুদ, ২০১১)

কালের সংকট উত্তরণের প্রয়োজনে শিল্পীকে কখনো কখনো অনতিক্রান্ত কালকে সম্মুখে রাখতে হয়। নজরুল তাঁর সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করে গল্পে যেসব সংকট তুলে ধরে বিশ্লেষণপ্রয়াসী, প্রায় শত বছর পরের আধুনিক সমাজ এখনও সেইসব সংকট থেকে মুক্ত নয়। বিশেষ করে বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থা শতাব্দীকাল পেরিয়ে এসেও অনেকটা অপরিবর্তিত। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যে নারী-সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্লেষণ প্রচুর। ইতিহাসের একটি পর্বে ধর্মীয়ভাবে নারীকে সকল পাপের উৎস বিবেচনায় জীবন্ত কবর অথবা সতীদাহ প্রথায় দগ্ধ করার বিধান ছিল। অন্যদিকে 'বঙ্গদেশে একসময় কন্যাসন্তান এতোই অবাঞ্ছিত ছিল যে, মেয়ে জন্মালে তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য করার জন্য বলা হতো মেয়েছেলে।' (মুরশিদ, ২০০৭ : ৭৯)। নজরুল তাঁর পারিপার্শ্বিকে বেড়ে-ওঠা নারীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের অবস্থান পরিবর্তনে প্রয়াসী ছিলেন। নবজাগরণস্নাত ভারতবর্ষের সমাজকাঠামো ও সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় নারীর যে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন ছিল এবং বাঙালি নারীরা যে ভূমিকা পালনে হয়েছিল ব্যর্থ, সেই ব্যর্থতার বেদনার আবেগ প্রকাশ পেয়েছে নজরুলের গল্পে। তিনি নারীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনার সহজ রূপটিকে গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নারী প্রসঙ্গে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয় যায় গল্পগুলোতে। তিনি তাঁর গল্পের জগৎ নির্মাণ করেছিলেন অস্থির অভিযাত্রীর দৃষ্টিতে। চর্চা করতে গিয়ে তিনি শিল্পশৈলীর দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ পাননি। তাছাড়া 'মহৎ' সাহিত্যিক হয়ে কালের গর্ভে বেঁচে থাকার বাসনাও তাঁর ছিল না। তিনি সমকালের কণ্ঠলগ্ন হয়েই তৃপ্ত ছিলেন। অবশ্য শৈলীর গুণে না হলেও বিষয়গুণে তাঁর গল্প কবিতার মতোই কালোত্তীর্ণ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে।

নজরুলের অধিকাংশ গল্প আত্মবিবৃতিমূলক। কেন্দ্রীয় চরিত্রের আত্মবিবৃতির মাধ্যমে কাহিনির বিস্তার ঘটেছে। তাঁর গল্পের নায়ক চরিত্রগুলো তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল। সমাজ-সংসারের বিচিত্র উৎস থেকে আহৃত নারী চরিত্রগুলো গল্পের কাহিনিবিন্যাসে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। জীবনের খণ্ড খণ্ড সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ভেতরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে নারীর অবস্থা ও অবস্থান।

টীকা

১. 'ফজিলতুন্নেসার পরে প্রেম ও রোমান্সের কিছু ব্যাপার ঘটে ঢাকার বনগাঁনিবাসী রানু সোম ওরফে প্রতিভা সোম ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা উমা মৈত্র (নোটন)-এর সঙ্গে।' (মাসুমা, ২০০১ : ৫১)

২. এবারেও নজরুল সিলেটে প্রায় ১ মাস ছিলেন, সে সময়ে তিনি সিলেটের লীলা মজুমদারকে 'সুর রাখী' নামে একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'তোমার কণ্ঠে বাঁধিয়াছে সুরের দেশের পাখী/ সুরেশ্বরের হস্তে বাঁধুক তোমার সুরের রাখী'। (রফিকুল, ২০১২ : ২২৭)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আজহারউদ্দীন খান (১৯৯৭)। *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলিকাতা।

আবদুল কাদির (১৯৮৯)। *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

আবদুল কাদির [সম্পা.] (১৯৬৬)। *নজরুল-রচনাবলী ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল কাদির [সম্পা.] (১৯৭০)। *নজরুল-রচনাবলী ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল কাদির [সম্পা.] (১৯৮৪)। *নজরুল-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আল মাহমুদ (২০১১, শুক্রবার ২৭ মে)। 'নজরুল-সাহিত্যে নারী'; *শিলালিপি*, কালের কণ্ঠ, ঢাকা।

খালেদা হানুম (২৩তম সংকলন, মে-জুলাই ২০০২)। 'নজরুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী', নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০৭)। *নারী ধর্ম ইত্যাদি*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

মাসুমা খানম (২০০১)। *নজরুল চেতনায় নারী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (২০১২)। *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র-খণ্ড ১২*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শাহনাজ মুন্নী (১৯৯৭)। *নারী জাগরণ ও নজরুল-সাহিত্যে নারী*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯৬০)। *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা।